নির্ভর সৌহার্দ্য

শিবনারায়ণ রায়

ব্রহ্মবাদীদের মতে ব্রহ্ম নাকি, নিরাকার, নির্গুণ, অবাঙ্মনসগোচর নন, তিনি সে কারণে সর্বাধিক সম্পর্কবিহীনও বটে। মুস্কিল হল, যুক্তিবিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ অনুসারে "তিনি" বললেই সম্পর্ক এসে যায় এবং তখন "প্রাতিভাসিক" জগৎকে পূর্বিতা দেওয়া ছাড়া ব্রহ্মবাদীদেরও উপায় থাকে না। বস্তুত, সম্পর্কবিহীন অস্তিত্ব অকল্পনীয়। অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা স্বয়ং শঙ্করাচার্যও কিছু আর স্বয়ম্ভু ছিলেন না। তাঁরও উদ্ভবের অনতিক্রম্য শর্ত ছিল বিশেষ একটি স্ত্রী এবং বিশেষ একটি পুষের ফলপ্রসু সঙ্গম। এবং ব্রহ্মজ্ঞানী হবার আগে তাঁকেও নিজের সংরক্ষণ এবং প্রবর্ধনের জন্য দীর্ঘকাল মাতৃগর্ভের অন্ধকারে অপরনির্ভর হতে হয়েছিল। আত্মন্ এবং ব্রহ্মন - এরতাত্ত্বিক সমীকরণ করা সত্ত্বেও আমৃত্যু তাঁর শরীরেও বংশাণুর স্বাক্ষর অনপনেয় থেকে যায়।

আমি না ব্রহ্মজ্ঞ না বেদান্তী। আমি সম্পূর্ণভাবেই ইহবাদী, এবং ইহলোকে প্রতি ব্যক্তিই যেমন একদিকে বিশিষ্ট এবং অপরের থেকে পৃথক, অন্যদিকে তেমন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বহু অপরের সঙ্গে অজস্র সম্পর্কে জড়িত। শ্রেণীবিভাগ করে এইসব বহুবিধ সম্পর্কের বিচার বিবেচনা করতে গেলে একটি কেতাবেও কুলোবে না। এখানে শুধু প্রধান দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়েই কিছুটা আলোচনা করা যাক।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সেই সব বিচিত্র সম্পর্ক যাদের আমরা নির্বাচন করি না, কিন্তু যারা আমাদের জীবনবৃত্তান্তের অপরিহার্যঅঙ্গ। প্রথমেই আসে রক্ত সম্পর্কের কথা। আমরা কেউই মাতাপিতাকে বেছে নিতে পারি না, কিন্তু পছন্দের হোক বা না হোক তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। আমরা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বে তাঁদের বংশাণু বহন করি না; তাঁদেরই সূত্রে অতীতে, বর্তমানেএবং ভবিষ্যতে বিস্তারিত শাখাপ্রশাখায় বহু স্ত্রীপুষের সঙ্গেই আমরা শোণিতসম্পর্কে যুক্ত। দিদিমা, দাদামশায়, ঠাকুমা, মাসি ও মামা,পিসি, জ্যাঠা এবং কাকা, শেষোক্তদের স্বামী, স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা, আমাদের নিজেদের ভাইবোন --- সব মিলিয়ে রক্তসম্পর্কের জাল দূরপ্রসারী। নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। আমার এক নিকট আত্মীয়ের সংগ্রহে আমাদের একটি বংশতালিকা দেখেছি ইতিহাসের উজান বেয়ে যেটি পৌঁছেছে বাদশাহ জাহন্গীরের আমলে। আমাদের সেই ঐতিহাসিক পূর্বপুষ রাজা উপাধি অর্জন করে রায়েরকাঠি গ্রামে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুনেছি সে গ্রামের অগণিত রায়চৌধুরির সঙ্গে আমি রক্ত সম্পর্কে যুক্ত। অপরপক্ষে যে হেতু আমার বয়স আশি পেরিয়েছে, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে চাইলে দেখতে পাই শুধু পুত্রকন্যা নাতিনাতনিদের নয়, পুতিপুতনিদেরও বর্ণময় সমারোহ। এদিকে আমার মাতামহ স্বনামধন্য চিকিৎসক ভুবনের মিত্র পূর্বপুষদের কৃতির উপয় নির্ভর না করে নিজের সৌভাগ্য নিজেই রচনা করেছিলেন। মেদিনীপুরে তাঁর মস্ত জমিদারী, গোয়াবাগানে তাঁর তিনমহলা প্রাসাদোপম বাসস্থান, এবং পর পর তিনটি স্ত্রীর গর্ভে আটটি পুত্রসন্তান এবং দশটি কন্যারত্ন। (কখনও ভাবি, তিনি কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে টেক্কা দিতে চেয়েছিলেন?) বংশতালিকা থাক বা না থাক সংখ্যাবৃদ্ধির গৌরবে তিনি রায়েরকাঠির রায়চৌধুরিদের কাছে হার মানেননি।

এই যে রক্তসম্পর্কের বহুবিস্তৃত বন্ধন একসময়ে সব দেশেই অধিকাংশ স্ত্রী - পুষ জীবনধারণের জন্য তার উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করত। কিছু ব্যতিক্রম হয়তো সবসময়েই ছিল --- উদ্যোগী, প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন কোন কোন স্ত্রী - পুষ এই

বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের যাত্রাপথ নিজে রচনা করেছেন -- বুদ্ধ অথবা শঙ্কর, মীরাবাই অথবা রোজা লুক্সেমবুর্গ ইতিহাসের উপাদানমাত্র না হয়ে ইতিহাসে আপন আপন স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তবে পরম্পরাশ্রিত সমাজে রক্তসম্পর্কের বিশেষ ভূমিকা ছিল, এবং এখনো পর্যন্ত যে হেতু পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ঐতিহ্যই সমাজ সংগঠনের প্রধান ধারক, রক্তস ম্পর্কের বিশিষ্ট ভূমিকা মোটেই ফুরিয়ে যায়নি। অবশ্য নগরায়ন, যন্ত্রবিপ্লব এবং সম্প্রতিকালে ঝিায়নের ফলে বহু দেশে বিশেষ করে সমাজের উপরস্তরের স্ত্রীপুষদের জীবনে রক্তসম্পর্কের ভূমিকা প্রায়ই লক্ষণীয়ভাবে কমে আসছে। অনেকের বিচারে তারই অন্যতম ফল আধুনিক সমাজে পারক্যবোধের এবং চিত্তবিকারের প্রাবল্য। অর্থাৎ রক্তসম্পর্কের টান যত ক্ষীণতর হচ্ছে, ততই দুঃসহ হয়ে উঠছে ব্যক্তির জীবনে একাকিতাবোধের আর্তি। মনস্তাত্ত্বিকরা এবং সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন আধুনিক সমাজে একই সঙ্গে মর্ষকামী এবং ধর্ষকামী স্ত্রীপুষের সংখ্যাবৃদ্ধি তা থেকে আগ্রাসী গণপিণ্ডের উদ্ভব।

রক্তসম্পর্ক ছাড়াও আরও কিছু মৌল সম্পর্ক আছে যা আমরা জন্মসূত্রে পাই। যে ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক পরিবেশ,রাষ্ট্রিক-আর্থিক ব্যবস্থা, নৈতিক - সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ভাষা এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম আমাদের মানবীয় অস্তিত্বের প্রাথমিক পটভূমি, তার নির্বাচনে আমাদের কোনো হাত নেই। আমি জন্মেছি কলকাতায়, করাচি অথবা কিন্হাস ায় নয়; যে সমাজ আমার জন্মসূত্রে পাওযা তা উঁচু এবং নিচু জাতি - বর্ণে বিভক্ত; আমি ভারত রাষ্ট্রের নাগবিক, পুঁজিব াদী সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরে আমার অবস্থান; রামসীতা এবং রাধাকৃষ্ণ থেকে রামমোহন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও নজল এ সবই আমার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার; বাংলা আমার মাতৃভাষা; এবং আকৈশোর আমি নাস্তিক হওযা সত্ত্বেও জ ানি যে আমি জন্মেছিলাম গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী একটি হিন্দু পরিবারে। আমার নামই সে পরিচয় আজও বহন করেছে। ফলত, বয়ঃপ্রাপ্তির পর যদিও আমি জীবনের দীর্ঘ অংশ কাটিয়েছি জন্মসূত্রে পাওয়া ভৌগোলিক অবস্থান থেকে বহু দূরে; যদিও হিন্দুসমাজ এবং ধর্মের বেশিটাই মনুষ্যত্ববিরোধী বিবেচনায় আমি ধর্ম এবং সমাজের বিশ্বাসাদি এবং আচারঅনুষ্ঠান বহুদিন হল বর্জন করেছি; যদিও ভারত রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের চাইতে নিজের বিবেকবুদ্ধির প্রতি নিষ্ঠাকে আমি অনেক বেশি মূল্য দিই; যদিও পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর আমার কাম্য; যদিও ভারতীয় অথবা বঙ্গীয় স াংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের চাইতে আমি অনেক বেশি যত্নে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের অবদান নিয়ে চর্চা করেছি; যদিও সম্ভবত আমি বাংলায় যা লিখেছি আমার ইংরেজি লেখা তার চাইতে পরিমাণে বেশি--- তা সত্ত্বেও এ কথা না মেনে উপ ায় দেখি না যে জন্মসুত্রে পাওয়া প্রাকৃতিক সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিবেশ আমার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আমার বিবর্তনশীল প্রাতিস্বিক স্তরে স্তরে অনপনীয় স্বাক্ষর রেখে গেছে। যাঁরা পরম্পরা অনুসরণ করে এই পরিবেশকে মেনে নিয়েছেন এবং যাঁরা নানা কারণে হয় পরিবেশের আমূল রূপান্তরে নয়তো তা থেকে বিযুক্ত হতে উদ্যোগী, দুই পক্ষের উপরেই জন্মসূত্রে পাওয়া পরিবেশ প্রায় শেষ পর্যন্ত কমবেশি তার স্বাক্ষর রেখে যায়। নির্বাণসাধক বিপ্লবী ভাবুক বুদ্ধ জন্ম ান্তরবাদের প্রভাব এড়াতে পারেননি। কার্ল মার্ক্স বার্লিন থেকে পারি, পারী থেকে শেষ পর্যন্ত লন্ডনে জীবনের শেষ অংশ কা টিয়েছেন, কিন্তু চিন্তার অসামান্য মৌলিকতা সত্ত্বেও জার্মান দর্শন, বিশেষ করে হেগেলের প্রেতছায়া তাঁর চিন্তায় শেষপর্যন্ত তার অপরিহরণীয় ছাপ রেখে যায়।

শুধু স্থান নয়, সমকালের সম্পর্কধৃত ফ্রেমেও আমরা সকলেই কমবেশি বন্দী। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আমার জন্ম, বিশশতক নানাভাবে আমার জীবন এবং চিন্তাকে চিহ্নিত করেছে। উনিশ শতকের সাম্পর্কিক ফ্রেমের মধ্যে যদি আমার জীবন ধারা পড়ত তাহলেবিশ শতকের বৈপ্লবিক কাণ্ড - কারখানার প্রবল প্রভাব উজান বেয়ে নিশ্চয়ই আমার অস্তিত্বে প্রবাহিত হত না। পিছনে চাইলে দেখতে পাই বিশ শতকের কত প্রভাবশালী স্ত্রীপুষ, কত বিচিত্র আবিষ্কার - উদ্ভাবনা, ঘটনা ও অভিজ্ঞতা, ভ াবনা এবং আন্দোলন বিগত আট দশক ধরে বিচিত্র সম্পর্কের সূত্রে আমাকে শৈশব থেকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ, বলশেভিজম্ এবংফাসিজম্, মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং দেশবিভাগ, হিরোশিমা - নাগাসা কি, প্রতিষ্ঠিত ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যতন্ত্রগুলির দ্রুত অবক্ষয় ও বিলোপ, এশিয়া ও আফ্রিকাতে বড়ছোট নানা স্বাধীন র াষ্ট্রের উদ্ভব, সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান এবং উচ্ছেদ; পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম, অ্যান্টিম্যাটার, হ্যাড্রনস, লেপটন্স, কোয়ার্কস এবং লেসার জ্যোতিবির্জ্ঞানে বিগ্ ব্যাঙ, কোয়াসার, পালসার এবং ব্ল্যাকহোল, সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহ - উপগ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা সম্পর্কে দ্রুত বর্ধমান নির্ভরযোগ্য জ্ঞান; জীববিজ্ঞানে ডি. এন. এ. আর. এন. এ এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়া রিং ও ক্লোনং; পূর্ববর্তী শতকগুলির তুলনায় বিশ শতকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিবেশদূষণ; ফ্রয়েড এবং পোস্টমডা

র্নিজম; ট্রানজিস্টর, কমপিউটার, টেলিভিশন, কম্প্যাকট ডিস্ক, ইনফর্মেশ্যন এবং কমিউনিকেশ্যনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের পরে বিপ্লব; স্পুটনিক, স্পেস ক্রাফট পৃথিবী পরিক্রমা, চন্দ্রে এবং মঙ্গলগ্রহে অবতরণ, স্পেস স্টেশন; চক্ রিভার, থ্রি মাইল আইল্যান্ড এবং চার্নোবিলে পারমাণবিক দুর্বিপাক; জন্মনিরোধক বড়ি, পোলিও ভ্যাকসিন, এইড্স ভাইরাস, ম্যাকডোন্যাল্ড এবং মাল্টিন্যাশন্যালস্; চিত্রকলার পিকাসো - মাতিস শাগাল থেকে কারেল আপেল - বাসারেলি - জ্যাকসন পোলক; সাহিত্য রিল্কে -- এলিয়ট - নেদা - জয়েস - টমাস - কাফ্কা থেকে কাম্যু-কোয়াবাটা - মারকুয়েজ - নেগিব মাহ্ফুজ - চিনুয়া আচেবে - আল আমিন --- তালিকা বাড়াবো না -- এরা প্রত্যেকেই আমর এবং বিশ শতকের অন্য আরও অনেক স্ত্রী - পুষদের জীবনে সচেতন - অর্ধচেতন - অবচেতনে নানাভাবে কমবেশি স্বাক্ষর রেখেছে। এরা কেউই আমাদের নির্বাচিত নয়, কিন্তু আমাদের পরিবেশের এরা অনপনেয় অঙ্গ, এবং আমাদের ব্যক্তিতা এদের সঙ্গে নানা সম্পর্কে বিজড়িত। রক্ত সম্পর্কের মত এদের বিষয়ে আমরা সর্বদা সচেতন থাকি না। কিন্তু স্থির হয়ে একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট ধরা পড়ে সমকালের স্ত্রীপুষ, ভাবনাচিন্তা, আচারআচরণ, ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কত গভীর, এবং সেই সম্পর্ক কীভাবে আমাদের ব্যক্তিতাকে পুষ্ট অথবা ব্যাহত করে। ফলত প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর থেকে পৃথক বটে, কিন্তু কেউই একেবারে অনন্যতন্ত্র নয়। স্থান - কাল - পাত্রের সম্পর্কসূত্রে সে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় পুষ্ট এবং বন্দী।

অবশ্য যে সব অসংখ্য সম্পর্কে আমরা অপরের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়। অথচ সামান্যতম চিন্তা করলেই তাদের অনতিক্রম্য উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের খাদ্যবস্তু, আমাদের পরিধেয়, আমাদের বাসস্থান, আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের ভাষা, আমাদের শিক্ষা, ব্যাধিত্বে আমাদের ঔষধ এবং চিকিৎসা --- এদের প্রতেকটিই অপর স্ত্রীপুষদের শ্রম এবং সহযোগের উপরে নির্ভর করে। যে চাষীদের পরিশ্রমে জমিতে ফসল ফলে, যেসব কারিগর এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিপুণ প্রচেষ্টায় বাড়িঘর, পথঘাট, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্ভব হয়, যে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে ব্যাধির প্রতিষেধক নানা ঔষধউদ্ভাবিত হয়, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও, রক্তসম্পর্কের তুলনায় তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কোনও হিসাবেইঅ প্রধান বলা চলে না। এবং নিত্যদিনের ব্যবহারের জন্য যে ভাষা না থাকলে আমাদের অবস্থা পশুতুল্য এবং যে জ্ঞানের উত্তরাধিকার না থাকলে আমরা আজও আদিম অবস্থায় বাস করতাম, সেই ভাষা এবং সেই জ্ঞান বহুযুগের সমবেত সাধনা যাঁরা গড়ে তুলেছেন, সেই পূর্বপুষদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় না ঘটলেও তাঁদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয় সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। অর্থাৎ সংখ্যাতীত সম্পর্কের সূত্রে অতীত এবং বর্তমানের, নিকট এবং দূরের বহু স্ত্রী - পুষ আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত, এবং প্রত্যক্ষে হোক অথবা পরোক্ষে হোক এই বহু বিস্তৃত বন্ধন আমাদের জীবনকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করে।

।।দুই।।

এবারে দ্বিতীয় প্রকৃতির সম্পর্কের কথায় আসি। এ হল সেই ধরনের সম্পর্ক যা আমরা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে বেছে নিই। আমাদের ধারণা, সম্ভবত সব স্ত্রীপুরষেরই এমন কিছু সম্পর্ক থাকে যা শুধুমাত্র পড়ে পাওয়া নয়, যা তাদের সচেতনভাবে বেছে নেওয়া। রক্তসূত্রে অথবা দেশকাল পরিবেশ সূত্রে যে সম্পর্করাজির মধ্যে তাদের অবস্থান অধিকাংশ মানুষ তাদের ভিতরেই কোন কোন বিশেষ সম্পর্ক বেছে নেয় যারা হয়ে ওঠে তাদের অন্তরঙ্গ বা বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। মাতৃকুল এবং পিতৃকুল মিলিয়ে আমার বিস্তারিত রক্তসম্পর্কের যাঁরা অন্তর্ভুক্ত এবং যাঁদের আমি কোনও না কোনও সময়ে দেখেছি, তাঁরা সংখ্যায় নিশ্চিতভাবে শতাধিক, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে এখন মনে পড়ে বাল্যাবস্থা পেরোবার পর যাঁদের আমি একান্ত নিকটজন বলে নির্বাচন করে নিয়েছিলাম এবং যাঁদের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্ক পরবর্তীকালে শিথিল হয় নি। রক্তসম্পর্কিত কিন্তু নির্বাচিত এই জনদের মধ্যে ছিলেন আমার প্রাজ্ঞ এবং প্রশস্তচিত্ত পিতা, আমার স্নেহময়ী পরহিতব্রতী জ্যেঠাইমা, আমার আত্মপ্রত্যয়ী, অকুতোভয়, মনস্বিনী ছোট দিদি, এবং আমার সত্যনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার, আদর্শবাদী সমবয়সী ভাগিনেয়। স্কুলে পড়ার সময়ে দ্বিশতাধিক সহপাঠির মধ্যে শুধুমাত্র একজনই ছিল আমার যথার্থ সহমর্মী --- আমরা দুজনে মিলে পাঁচ / ছ বছর ধরে নিয়মিতভাবে "ভারতী" নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বার করতাম। ঝিাবিদ্যালয়ে যে তিনজন সতীর্থ আমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ জন হয়েছিলেন তাঁরা কেউই বাঙালি নয় আমাদের চারজনের প্রত্যেকের পাঠ্য বিষয় ছিল আলাদা, কিন্তু কোন এক গভীর রহস্যময় টানে আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হই, এবং সেই আকর্ষণ অ

ামৃত্যু বজায় থাকে। আনন্দশঙ্কর এসেছিলেন গোরক্ষপুর থেকে, তাঁর বিষয় ছিল অর্থনীতি, এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। অনিদ্ধ ঝা ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মানুষ, তাঁর বিষয় ছিল দর্শনশাস্ত্র, পাটনা ঝিবিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর কয়েকবছর আগে তিনি পঞ্চভূতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর মামনচাঁদ রামজীদাস সুদূর হিস্‌সারের ছেলে, তাঁর বিষয় ছিল কমার্স, পরবর্তীকালে দিল্লীতে একজন শিল্পপতি হয়ে ওঠেন। ঝিবিদ্যালয়ে পাঠকালে অন্য ছাত্রছাত্রীরা আমাদের নাম দিয়েছিলেন ফোর মাস্কেটিয়ার্স। মৃত্যু ছাড়া আর কোনও ঘটনাই আমাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখছি, কিন্তু মনে হয় এ ব্যাপারে আমরা একেবারে ব্যতিক্রম নয়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে অধিকাংশ স্ত্রীপুষ পরিচিত বা স্বল্পপরিচিত মানুষদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে বেছে নেয় যাদের সঙ্গে তাদের মনের মিল আছে এবং যারা তাদের কাছে অপরদের তুলনায় বেশি আস্থাভাজন, আকর্ষণীয় এবং হৃদয়সংবাদী। এই ধরনের সম্পর্ককে প্রেম বলা চলে না, যদিও বাংলায় ভালবাসা শব্দটির সামান্যাভিধান এতই বিস্তৃত যে সবরকমের প্রিয় সম্পর্ককেই তার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কিন্তু 'প্রেম' শব্দটির ব্যক্তার্থ সে হিসেবে অনেকটা সংকীর্ণ।

আমি এখানে যে - ধরনের স্বনির্বাচিত সম্পর্কের কথা লিখছি, সেটি বোঝাতে হয়ত বন্ধুত্ব অথবা সৌহার্দ্য শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। বন্ধুত্ব সচরাচর সমবয়সীদের মধ্যে হয় বটে, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি খুব গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেমন বয়সের উপরে নির্ভর করে না, তেমনই মাতৃভাষা, ধর্ম, দেশ এমনকি হয়তো কালের গণ্ডী দিয়েও তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এটি একদিকে নির্ভর করে ব্যক্তিমনের বিশিষ্টতার উপরে, অন্যদিকে অনেকটা অবস্থা সন্নিবেশের উপরে।

আবার নিজের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে ব্যাপারটা স্পষ্টতর করতে চাই। আমার দীর্ঘজীবনে যে মানুষটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক সব চাইতে দৃঢ়মূল হয়েছিল তিনি বয়সে ছিলেন আমার চাইতে সতেরো বছরের বড়, জন্মসূত্রে জার্মান, ইউরোপে বিপ্লব - প্রতিবিপ্লবের আগুনে পোড়-খাওয়া বহুগুণসম্পন্না মেধাবী রমণী। প্রথম সাক্ষাতেই আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হই, এবং সান্নিধ্য - সহযোগ - আলাপ - আলোচনা - চিঠিপত্রের এবং কাজকর্মের সূত্রে সেই আকর্ষণ দৃঢ়মূল এবং ফলপ্রসূ হয়। এলেন রায় আমাকে জার্মাণ ভাষা এবং সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী করে তোলেন, আমি যুবধর্মের আত্মপ্রত্যয়ে তাঁকে দর্শন, ইতিহাস এবং চিত্রশিল্প চর্চায় উদ্বুদ্ধ করি। আমরা দুজনে একত্রে In Man's Own Image নামে একটি বই লিখি, এবং ছ'বছর একত্রে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করি। কে যে কাকে প্রথম বেছেছিলাম বলা শক্ত; মনে হয় ১৯৪৬ সালে মে মাসে যুগপৎ বাপারটি ঘটেছিল। আর যাঁর সূত্রে স্বাধীন এবং সম্পন্ন এই সৌহার্দ্যের সূচনা ঘটে, তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ছিল চৌত্রিশ বছরের। বয়সের চাইতেও অনেক বেশি পার্থক্য ছিল অভিজ্ঞতার। বহু দেশে বহু বিপ্লবে তিনি একজন প্রধান পষ দীর্ঘদিন তাঁর কেটেছে বিভিন্ন কারাগারে। অপরপক্ষে জেল -এ যাওয়া দূরের কথা, রাজনীতি আমাকে কখন্য বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেনি। অথচ একটি শিক্ষাশিবিরের পর তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপিত হল রায় দম্পতির মৃত্যুর চার / পাঁচ দশক পরেও তা আজ পর্যন্ত শিথিল হয়নি। তাঁদের জীবন এবং চিন্তা নিয়ে চর্চা আমি এখন পর্যন্ত করে যাচ্ছি। ভক্তি অমার প্রকৃতিতে নেই; মানবেন্দ্রনাথ রায় জানতেন আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করলেও ভক্তি করি না। কিন্তু মননের ক্ষেত্রে আমাদের যে সামীপ্য দুজনের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাই ছিল আমাদের অচ্ছেদ্য সুহৃদ সম্পর্কের ভিত্তি। একপক্ষের অনুপস্থিতিতেও সেই চিত্তপ্রকর্ষের সম্পর্কে আজ পযান্ত ছিন্ন হয়ে যায়নি।

অথচ কলকাতায় পনের বছর অধ্যাপনার কালে আমার কলেজি সহকর্মীদের সঙ্গে আদৌ কোনও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সূচনা ঘটেনি। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে অধ্যাপনার সূত্রে যখন আমি বম্বে যাই সেখানে খুব দ্রুত যাঁদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাঁদের মধ্যে একজনও বাংলাভাষী ছিলেন না। অবশ্য মানবেন্দ্র এবং এলেনের সূত্রে বম্বে যাবার আগেই গোবর্ধনদাস পারিখ, এ.বি.শাহ এবং নিসিম ইজেকিয়েল আমার অন্তরঙ্গজন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বম্বেতে যাঁরা প্রথম পরিচয়ের পর অল্প সময়ের ভিতরে সুহৃদ হয়ে উঠেলেন তাঁরা একজনও "রায়পন্থী" ছিলেন না। তাঁরা আমাকে এবং আমি তাঁদের বন্ধু হিসেবে যে বেছে নিই তার প্রধান কারণ আমার মত তাঁদের সকলেরই ছিল সাহিত্যে দুর্মর নেশা। পার্শি কুমারী রতি বোগড়াওয়ালা, কর্ণাটকি অম্বিনীকুমার যুগল পি. এস. রাও এবং সুমথেন্দ্র নাডিগ, মারাঠি অশোক সাহানে, তামিল তণ ছাত্র অশোক শ্রীনিবাস, আমার সমবয়স্ক মহারাষ্ট্রীয় কবি বিন্দা করন্দিকর --- অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে উঠলেন আমার নিকট আত্মীয়। আসলে মনের মত মানুষ সর্বত্রই আছে, তবে আবিষ্কারের জন্য খুঁজতে হয় এবংবাছতে হয়। এ স

স্পর্ক রক্তের নয়, এ সম্পর্ক চিত্তের।

এটা স্পষ্টতর হল যখন মহাসমুদ্র পেরিয়ে কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করলাম পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে অস্টেলিয়া মহাদ্বীপে। আমরা যখন মেলবোর্নে পৌঁছই তখন পর্যন্ত আমার সঙ্গে সেখানকার আধিবাসী মাত্র একজনের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল; ঝিবিদ্য ালয়ে তিনি আমার সহকর্মী সংস্কৃতজ্ঞ বেলজিয়ান জোশেফ জর্ডেনস্। কিন্তু বছর না কাটতেই সেই কাঙা - কোয়ালার দেশে অনেক সমধর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল। দার্শনিক অ্যালান বয়েস গিবসন, দুই কবি জেমস মেকলি এবং ভিনসেন্ট বাকলি, পোল্যান্ড থেকে আগত প্রাজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধা দম্পতি রোমা এবং রিচার্ড ত্রিগিয়ার, সমাজসেবী দম্পতি ডায় ানা এবং ডেভিড স্কট, পত্রিকা সম্পাদক পিটার কোলম্যান এবং ডোন্যাল্ড হর্ন, হাঙ্গেরিয়্যান অধ্যপক ব্যারন রাড্ভান্স্কি, বস্তুবাদী দার্শনিক ডেভিড আর্মস্ট্রং, নোবেল লরিয়েট মস্তিস্ক বিজ্ঞানীজন এক্ল্স, ঐতিহাসিক ওযাঙ্গা গাংগু, ভারতবিদ ব্য াশ্যাম --- এবং আরও অনেকে তাঁদের সৌহার্দ্যে আমার জীবন সম্পন্ন করে তুললেন। তবে সবচাইতে বেশি কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন তণ - তণী আমার কিছু ছাত্রছাত্রী - ঝিবিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বাইরে আমাদের গৃহে তাঁদের নিয়মিত সমাগম ঘটত -- তাঁদের অনেকের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক এখনও অটুট হয়ে আছে। আমাকে তারা অধ্যাপক হিসেবে অথবা আ মি তাদের ছাত্রছাত্রী হিসেবে বাছিনি, আমরা পরস্পরকে বেছেছিলাম বন্ধ হিসেবে। ম্যারিয়্যান ম্যাডার্ন, এলিজাবেথেরব াচ্কোভস্কি, আকোশ অস্টার, রেমন্ডগেইটা, মেরি মিকেলাইডিস, ট্রেভর ক্রেচমার উটে আকের, মেরেডথ বর্থউইক, হেলেন আডোরিয়ান মাইকেল হেলমার, সু প্রিঙ্গল, রন লিনসার, ডি ত্রিস্টেন, রিচার্ড হাওয়ার্ড, হিলজ কিনেয়ার্ড, ইরিনা ব্রত্শে াভা, যোশেফ ম্যাক --- কারও মাতৃভাষা হাঙ্গেরিয়্যান, করাও চেক, করাও ম্যনিয়্যান, যোশেফ ম্যাক --- কারও মাতৃভাষা হাঙ্গেরিয়্যান, করাও চেক, কারও ম্যানিয়্যান, কারও জার্মান কারও ফরাসী, কারও রাশিয়ান, কারও গ্রিক --- তাঁরা অ াপন আপন ভাষা থেকে নির্বাচিত কবিতা এবং তার স্বকৃত অনুবাদ পড়ে শোনাতেন, এবং ক্লারেট ও রিজ্লিং - এর সঙ্গে কাব্যাস্বাদন মিশে আমাদের জমজমাট আড্ডা মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যেত। এমনকি। আমরা মিলিত ভাবে 'বাক্'' নামে একটি কাব্যসংকলন বার করেছিলাম ভারতবিদ্যা চর্চার সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

এখন এই যে বাছাই করা সম্পর্কের কথা বলছি -- যার অপর নাম বন্ধুত্ব হতে পারে -- তার একটি লক্ষণ হল তাতে উভয়পক্ষের মধ্যে কারোরই এ থেকে স্বার্থসিদ্ধির কোনও আভাস মাত্র নেই। দ্বিতীয় লক্ষণ, এই সম্পর্কের ফলে অবিমিশ্র এবং দুর্লভ আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ। এবং তৃতীয় লক্ষণ, এ সম্পর্কের মধ্যে কোনও বন্ধন নেই, এটি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে নির্বাচিত। বিনা দ্বন্দ্ব অথবা বিরোধেই এটি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে হয় এ সম্পর্ক মনে রেখেই লিখেছিলেন, আসা - যাওয়া দু'দিকেই খোলা রবে দ্বার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক অনেকখানি ভার সইতে পারে (আমার জীবনে তেমন অভিজ্ঞতা কয়েকবারই হয়েছে), কিন্তু তার জন্য কোনও পক্ষেই কোনও দাবিদাওয়া নেই। মানুষে মানুষে যত রকম সম্পর্ক হতে পারে, এটিই আমার বিবেচনায় সব চাইতে উপভোগ্য, নিষ্কলুষ এবং কাম্য।

।। তিন ।।

সর্বাধিক কাম্যতার প্রস্তাবে অনেকে হয়তো আপত্তি করতে পারেন। বন্ধুতার যে বিখ্যাত বিবরণের সঙ্গে চানক্য শ্লোকের দৌলতে আমরা সকলেই পরিচিত -- উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র বিপ্লবে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে যিনি সর্বত্রই সঙ্গী তিনিই যথার্থ বান্ধব- তেমন বন্ধুতা অতি দুর্লভ, কোটিকে গোটিক হয়তো মেলে --- যাঁর কপালে তেমন বান্ধব জুটে গেল তিনি মহা সৌভাগ্যবান। আমি যেসম্পর্কের কথা বলছি তা ঠিক তেমন হীরকতুল্য নয়, তবে সে সম্পর্ক যে বিশেষভাবে ক াম্য এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত সন্দেহের অবকাশ দেখি না। তা সত্ত্বেও সকলের কাছে এই সম্পর্ক যে সর্বাধিক কাম্য না ঠেকতে পারে, বিনা বিতর্কে এ প্রস্তাব আমি মেনে নিতে প্রস্তুত।

এবারে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্য একটি প্রসঙ্গে আসি। আমার কাছে যেটি সর্বাধিক কাম্য হয়তো সেই সম্পর্কটিকে বাদ দিলে বাকি অধিকাংশ সম্পর্কেই এক ধরনের মৌল স্ববিরোধ বর্তমান। ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করেই দেখিয়েছেন এই স্ববিরোধ মানবচরিত্রে অন্তর্নিহিত । একদিকে আছে সেইসব সহজাত বৃত্তি বা ব্যক্তিকে অপরের সঙ্গে প্রীতি, স্নেহ, করুণা, সেবা,সহযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে যুক্ত করে -- ফ্রয়েডিয় ভাষায় এই বৃত্তি - সমুচ্চয়ের সাধারণ নাম এরস (Eros)। অপরদিকে আছে সেই সব বিপরীত বৃত্তি যা ব্যক্তিকে অপর থেকে বিযুক্ত করে - অহঙ্কার, মাৎসর্য, কর্তৃত্ব স্পৃহা,

মালিকানাবোধ, লোভ ক্রোধ, ধর্ষকাম এবং মর্ষকাম,আগ্রাসনের প্রবণতা, ধবংসবৃত্তি ---ফ্রয়েডিয় ভাষায় যাদের সাধারণ নাম --- থানাটস (THANATOR)। মুস্কিল হল যে এই সব বৃত্তি বহুক্ষেত্রে এমনভারে পরস্পরের সঙ্গে মিশে থাকে যে তাত্ত্বিক বিচারে তাদের স্বতন্ত্র করা গেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের জট ছাড়ানো খুব কঠিন। ধরা যাক্ মাতৃস্নেহের কথা যেটির প্রশস্তিতে বাঙালি মাত্রই গদগদ। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে অধিকাংশ স্ত্রীপুষের ক্ষেত্রে নাড়ির টানের মত প্রবল টান আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। কিন্তু মা যেমন স্বভাবতই বুকের দুধ থেকে তাঁর জীবনের প্রায় সবটাই দিয়ে সন্তানের পোষণ এবং বর্ধন করেন তেমনই কি তিনি তাঁর ভালবাসার বন্ধনে সন্তানকে এমনভাবেই বন্দী করতে চায় না যাতে সে কখনও স্বাধীন এবং সাবালক হয়ে সেই শৃঙ্খল ভেঙ্গে বাইরের জগতে না বেরিয়ে পড়তে পারে? এটি লক্ষ করে ক্ষুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছিলেন যে বঙ্গজননী তাঁর সাতকোটি সন্তানকে বাঙালি করে রেখেছেন, মানুষ করেননি। ছেলেরা প্রেমে পড়লে এবং প্রেমে পড়ে বিয়ে করলে খুব কম মা-ই সেই বউকে আপনজন করে নিতে পারে। মায়ের ভালবাসার সঙ্গে কর্তৃত্বস্পৃহার এবং দখলিসত্ত্বের দাবি মিশে প্রায়শই বহিরাগত বধূটির জীবন বিপর্যস্ত করে থাকে।

এই স্ববিরোধ শুধু মা এবং ছেলের সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ নয়। পিতা - পুত্র, স্বামী - স্ত্রী, ভাই-বোন, বোন বোন সব নিকট সম্পর্কের মর্ধেই কি আমরা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাষায় প্রেম এবং অপ্রেমের যুগপৎ উপস্থিতি এবং দ্বন্দ্ব দেখতে পাই না? যে সব সমাজে শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ অনেক বেশি ব্যাপক সেখানে অপ্রেমের প্রাবল্য অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। এটির পরিচয় মেলে পূর্বপুষের (generation) সঙ্গে পরবর্তী পুষের নিরন্তর সংঘাতে, বিবাহবিচ্ছেদের দ্রুতবর্ধমান পরিসংখ্যানে, যুবক - যুবতী এবং প্রৌঢ় - প্রৌঢ়াদের মধ্যে মানসিক ব্যাধির প্রায় অপ্রতিরোধ্য বিস্তারে, বালক- বালিকাদের চিতে এবং আচরণে হিংস্র প্রবণতার বহুল উদ্ভবে। মার্কিন দেশে অধ্যাপনার সময়ে এই সমস্যার অপ্রিয় অভিজ্ঞতা বারেবারেই হয়েছে। পরস্পরনির্ভর সমাজে মানবীয় সম্পর্কের স্থিতিস্থাপকতা এবং স্থায়িত্ব লক্ষণীয় ভাবে বেশি। কিন্তু তার প্রধান কারণ ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজে যারা অত্যাচারিত তারা মোটামুটিভাবে মুখ বুজে অত্যাচার সইতে অভ্যস্ত। ধর্ম, ব্যবহার শাস্ত্র, নীতিশিক্ষা, সমাজ এবং পরিবারের বিবিধ্যবস্থা ও সংগঠন সব কিছুই অত্যাচারিতকে শেখায় নির্বিরোধে অত্যাচার সইবার আদর্শ। স্বামী মাতাল হয়ে স্ত্রীকে ঠেঙালে, মা - বাপ রাগের মাথায় ছেলেমেয়েকে গালাগালি করলে অথবা দু'ঘা দিলে, উপরতলার মানুষ সমাজে নিচের তলায় মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে অথবা নানাভাবে তাদের শোষণ - শাসন করলে, পরম্পরাশ্রীয় সমাজে যারা অত্যাচারিত তারা বড় একটা বিদ্রোহ করে না। পুষানুক্রমে তাদের নানাভাবে শেখানো হয় ঘাসের মত সহনশীল হওয়াই তাদের যথার্থ ধর্ম। ফলে সম্পর্ক টেঁকে বটে,কিন্তু তা দু'পক্ষেরই গভীর ক্ষতি করে। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় যারা শোষণশাসন করে তারা ক্রমে যেমন নির্বিবেক, নিষ্ঠুর এবং স্থূল - প্রকৃতির হয়ে ওঠে, যারা নির্বিবাদে অত্যাচার সহ্য করে তারা ক্রমে একধরণের মানুষ - ঢেঁড়শে পর্যবসিত হয়। শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের ফলে মানুষে মানুষে বিরোধের যে বৃদ্ধি ঘটে তা নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু পরম্পরাবাহিত মানবীয় সম্পর্কের সূত্রে যে আপেক্ষিক নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে তা যখন এক পক্ষকে নির্বিবেক কর্তামিতে অভ্যস্ত করে এবং অন্যপক্ষকে নির্বোধ আত্মমর্যাদাহীন অন্ধকার দাসত্বে ঠেলে দেয়, তখন সেই পরম্পরাকে ভেঙে ফেলা ছাড়া মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্য পন্থা আছে কিনা সন্দেহ।

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ছাড়াও ব্যক্তির সঙ্গে সমূহের সম্পর্কের সমস্যাও কম কঠিন নয়। দেশপ্রেমবোধ জাগ্রত হলে মানুষ দেশবাসী অন্য মানুষদের সঙ্গে ঐক্যবোধের সূত্রে যুক্ত হয়। এই ঐক্যবোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ একসময় রাখিবন্ধন উৎসবকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশাত্মবোধ বা স্বজাতিপ্রেমের অপর যে দিকটি আছে সেটি রবীন্দ্রনাথের চেতনায় গোড়াতেধরা না পড়লেও পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আগেই সেটি লক্ষ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ন্যাশন্যালজিম্ বা স্বদেশপ্রেমের ধারণাটিএ দেশে এসেছে ইউরোপ থেকে এবং এর দুটি পরস্পরসম্পূরক দিক আছে । একদিকে এই বোধের ফলে রাম-শ্যাম -যদু - মধু নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের চাইতে দেশের স্বার্থকে বড় বলে অনুভব করতে শেখে, আত্মনিমগ্ন সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে তারা বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পায়। কিন্তু অপরদিকে এই স্বজিতিপ্রেমকে প্রবল করে তুলতে হলে, এমনকি বাঁচিয়ে রাখতে হলেও চাই এক শত্রু জাতির অস্তিত্ব যার সঙ্গে বিরোধের ভিতর দিয়েই এই স্বাজাত্যবোধ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকায় ভিতর দিয়ে ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান আপন আপন দেশ ও জাতিপ্রেমকে সুপ্রবল করে তোলে। এদেশে এক সময় ইংরজবিদ্বেষ ছিল স্ব

াদেশিকতার প্রধান উৎস। স্বাধীনতালাভের পরে তার স্থান নেয় মুখ্যত পাকিস্তান বিদ্বেষ কিছু সময়ের জন্য চিন-বিদ্বেষ। জাতি - বৈরের সমস্যা ছাড়াও দেশপ্রেমের মধ্যে আরেক প্রকৃতির বিপদ নিহিত থাকে। স্বাধীন দেশের মুখ্য শক্তিকেন্দ্র দেশের রাষ্ট্র বা সরকার দাবি করে প্রতি নাগরিকের কাছে বিচার - বিবেকহীন অনুগত্য। ভারত - পাকিস্তান বা ভারত - চিনের সংঘাতে ভারতযদি স্পষ্টতই আগ্রাসী হয় তাহলেও স্বদেশপ্রেমের নির্দেশ অনুসারে প্রতি ভারতবাসী নাগরিককে ত ার স্বদেশকেই সমর্থন করতে হবে। তা যদি সে না করে তাহলে তাকে দেশপ্রেমিকরা আত্রমণ করে দেশদ্রোহী বলে, র াষ্ট্রশক্তি আর দমনে অবিলম্বে উদ্যোগী হয়। অর্থাৎ দেশপ্রেম, যা ব্যক্তিকে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে এবং সে কারণে EROS বৃত্তিনিচয়ের অন্তর্গত, তাই তখন হয়ে দাঁড়ায় উগ্র বিদ্বেষ, যুদ্ধতথা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সমর্থক, অর্থাৎ THANATOS-এর প্রকাশ। এক্ষেত্রে দেশপ্রেমের চাইতে বিবেকবুদ্ধিতে অনেক বেশি মূল্য দিতে চাই। অর্থাৎ মনে হয় মানবচরিত্রে THANATOR- এর দুর্বার প্রবণতাকে প্রতিরোধের জন্য একা EROS-এর শক্তি যথেষ্ট নয়। প্রেমের সঙ্গে বিচারবুদ্ধি এবং বিবেকের সম্মিলন ঘটে তবেই হয়তো মানুষের প্রাজাতিক মারণবৃত্তি বা আগ্রাসী বৃত্তিকে অনেকখানি সংহত করা সম্ভবপর। ফলত সমূহের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ব্যক্তির জীবনে যেমন পুষ্টি, বিকাশ এবং নিরাপত্তা অর্জিত হয়। তেমনি শক্তিমত্ত সমূহের আগ্রাসী দাবি ব্যক্তিকে বিবেকরিক্ত, ধর্ষকামী জাতিবৈরের বলিতেও পর্যবসিত করতে পারে।

।।চার।।

মানবীয় সম্পর্কের প্রকাশে অথবা নিহিতভাবে যে দ্বৈতের উপস্থিতির প্রসঙ্গ এসেছে তার আর একটি দিকের উল্লেখ করে এই অসমাপ্ত আলোচনায় আপাতত যতি টানব। কৃষ্ণ অর্জুনকে নিমিত্তমাত্র হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষ্ণের দাবি ছিল যে তিনি ধর্মের সংস্থাপন এবং অধর্মের বিনাশের উদ্দেশ্যেই সব্যসাচীকে নিমিত্তমাত্র রূপে নিযুক্ত করেছেন। অবশ্য মহাভারতের মহাহত্যাকাণ্ডের শেষে যে মহাশ্মশানকে আমরা দেখি যেখানে কোন রকমের ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা না বিশ্বাস্য না কল্পনীয়। মার্কিনী মহাপ্রভুরা এভাবেই হিরোশিমাতে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্টা করেছিলেন, এবং সম্প্রতি ইর াকে আরেকবার ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সবিশেষ উদ্যোগী। কিন্তু আর আরা যারা সাধারণ মানুষ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীস্ট্যা লিন, শ্রীহিটলার অথবা শ্রী বুশের নখকণার তুল্য ক্ষমতারও যারা অধিকারী নই, তারাও অপরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিত্যই নিজেরা কখনও নিমিত্তমাত্র বনি, কখনও অন্যদের নিমিত্তমাত্র বানাই। জমিদারি, কলকারখানা, সরকারি ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এইট খুবই স্পষ্ট। এদের ক্ষেত্রে যারা ওইসব ব্যবস্থায় উপরতলায় বাসিন্দা পর্যায়ত্রমেনিচের তলার বা সিন্দারা তাদের কাছে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনীয় উপায় বা উপাদান হিসেবেই গণ্য। জমিদারের কাছে নায়েব, গোমস্তা, প াইকপেয়াদা, এবং চাষী; কারখানার মালিকের কাছে ম্যানেজার, খাজাঞ্চি, প্রযুক্তিবিদ, ছোটবড় কর্মচারী, মজুর, খরিদ্দার; সরকারের কাছেআমলা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন সভা - পরিষদ - সংসদ, বিচারালয়, কারাগার, সচিব ও নিবন্ধক, র াজনৈতিক দল, সাধারণ নাগরিক --- সকলেই স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র। এসব ক্ষেত্রে একজনের সঙ্গে আরেকজনের যে স ম্পর্ক তার ভিত্তি একান্তভাবেই উপযোগিতা বাপ্রয়োজনসাধন। এখানে আত্মীয়তাবোধের প্রশ্ন অবান্তর। এ জাতীয় সম্পর্কে ব্যক্তি সাধিত্রে পর্যবসিত; এক ব্যক্তি বদলে অন্য ব্যক্তি দিয়ে কাজ চলে তাতে কর্তৃপক্ষের বিশেষ আসে যায় না। কিন্তু আম াদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও পারস্পরিক সম্পর্ক কি অনেকটাই নিমিত্তবোধের দ্বারা চিহ্নিত নয়? পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যার মত তা অবশ্য সব ক্ষেত্রে স্থূলভাবে ঘোষিত হয় না। কিন্তু মাতাপিতাএবং সন্তানের মধ্যে, স্বামী এবং স্ত্রী অথবা শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীর মধ্যে, গৃহস্থপরিবার এবং সেখানে যারা রাঁধে, রাসন মাজে, জামকাপড় কাচে তাদের মধ্যে কি পারস্পরিক উপযোগিতা বা নৈমিত্তিকতার সম্পর্ক একেবারে অলক্ষণীয়? বিশেষ করে পরম্পরানির্ভর সমাজে সন্তান যেমন মাতাপিতার বার্ধক্যাবস্থায় তাদের নির্ভরস্থল, সন্তান জানে জন্ম থেকে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত তার ভরণপোষণ নিরাপত্তার নিশ্চিত অবলম্বন তার মাতাপিতা। পারিবারিক জীবনে সেবা শান্তি, কায়িক এবং মানসিক সুখের জন্যে স্বামীর নির্ভর যেমন পতিব্রতা স্ত্রী, তেমনই উপার্জন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্ত্রীর একান্ত নির্ভর তাদের দায়িত্ববোধসম্পন্ন স্বামী। তার অর্থ অবশ্যই নয় এই সব সম্পর্কে ভালবাসা, মমতা বা শ্রদ্ধা অবর্তমান। কিন্তু নৈমিত্তিক দিনটি তখনি উদঘাটিত হয় যখন সন্ত ান সাবালক হয়ে মাতাপিতার নির্দিষ্ট জীবন থেকে ভিন্ন ধরনের জীবন বাছতে চায়। অথবা স্ত্রী উপার্জন করার ফলে সংস ারের সেবায় তিনি আর ততটা সময় অথবা মন দিতে পারেন না। ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মমতার আড়াল সরিয়ে নৈমিত্তিকতার

সংঘাত তখন প্রকট হয়ে ওঠে। মা বাবার মনে হয় সন্তান স্বার্থপর, স্বামীর মনে স্ত্রীর বিদ্ধে অভিযোগ এবং আক্রোশ জমতে শু করে। নগরায়ণ পারিবারিক সম্পর্কের এই সমস্যাকে ক্রমেই ব্যাপক এবং দুঃসহ কররে তুলছে এবং উপন্যাস যেহেতু নগরজীবনেরই সৃষ্টি, এই দ্বন্দ্ব আধুনিক উপন্যাসের একটি মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু গোড়াতেই বলেছিলাম অন্য সম্পর্কও সম্ভব। যে সম্পর্কে এক ব্যক্তি অপরকে কখনও তার প্রয়োজন সাধনের উপায় ভাবে না, যেখানে এক ব্যক্তির কাছে অপর ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক নিজগুণেই মূল্যবান। এই সম্পর্ককেই আমি বন্ধুত্ব বা সৌহার্দ্যআখ্যা দিয়েছি। এখানে সম্পত্তিবোধের, আগ্রাসনের, স্বার্থসাধনের অথবা উপযোগিতার কোনও প্রশ্ন নেই। কথ াটা আমি নৈর্বক্তিক তত্ত্ব হিসেবে পেশ করছি না। আমার দীর্ঘ জীবনে এ সৌভাগ্য বহুবার ঘটেছে। আমার ছাত্র জীবনের বন্ধু আনন্দশঙ্কর এবং অনিদ্ধ, অধ্যাপনাজীবনের বন্ধু রাও, নাদিগ, ম্যারিয়্যান ম্যাডার্ণ, আকোশ অস্টর, তানিয়া সিমোনভ, রাজনৈতিক জীবনের বন্ধু লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী, গোবর্ধনদাস পারিখ, গৌরকিশোর গোষ, সুশীল ভদ্র, আমার সাহিত্য জীবনের বন্ধু জেমস মেকলে, আয়ুন স্ত্রী আইয়ুব, সন্তোষ ঘোষ জাহিদা জাইদি, রশীদ করীম, নিসিম ইজেকিয়েল, অণ সরকার, আমার প্রৌঢ় জীবনের বন্ধু অমিতাভ চত্রবর্তী, বাবু গোগিনেনি, গেয়ার্ড কালেসেন, মারিক দেযভস্, প্রকাশ কর্মক ার, কামাল, তসলিমা নারসিন ---আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক শুদ্ধ আনন্দের - স্বার্থবোধ সম্পত্তিবোধ, নিমিত্তবোধ বা উপযোগিতার হিসেবে এ সম্পর্কে ছায়া ফেলেনি।

আর এই সম্পর্ক শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের অথবা জীবিত জনের সঙ্গে জীবিত জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সংকীর্ণ অর্থে অবশ্য বন্ধুত্বের জন্য সমকালীন অন্তত দুটি ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমি জানি যেমন একদিকে যাঁরা শুধু ভিন্ন দেশের নয়, অতীতকালের মানুষ তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সম্ভব, তেমনই অন্যদিকে যারা মানুষ নয় তাদের সঙ্গে কত গভীর হ ার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এবং সেই সম্পর্কে উপযোগিতা বা নৈমিত্তিকতার আভাস মাত্র থাকে না। অস্ট্রেলিয়া মহ াদেশে যে ব্রিক - ভিনিয়ার কটেজটিতে সপরিবারে পনের বছর কাটিয়েছি, সেটিতে আমার মান্যতম বিশেষ প্রিয়জন ছিল ব াগানের মাঝখানে ডালপালা মেলা বিরাট এবং সুপ্রাচীন একটি উইলো গাছ। বস্তুত এই উইলো গাছটির হাতছানিই আম াকে প্রথম ওই কটেজটিতে চুম্বকের মত টেনে আনে। আমার নানা সুখদুঃখ, ভাবনাচিন্তা, পরিকল্পনা এবং পণ্ডশ্রমের সে ছিল যেমন অংশীদার, তেমনই হেমন্ত ঋতুতে তার শান্ত আনন্দময় রূপ, বসন্তেরহাওয়ায় তার ডালপালার নৃত্যনাট্য, বর্ষ ায় তার নীরব অবিরল কান্না আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে মধু সঞ্চারিত করত। শান্তিনিকেতনে বিগত দু'দশক ধরে যে ব াড়িটি আমার স্থায়ী ঠিকানা সেটিকেও নির্বাচন করি একটি মহাতর আকর্ষণে। তার বিস্তীর্ণ ডালপালা জুড়েফুটেছিল রক্তবর্ণ মদিরাপাত্রের মত অজস্র ফুল --- সে আমাকে ডাকছিল , এসো এসো তোমার জন্য তো অপেক্ষা করছি। কি সাধ্য সেই সম্মিলিত নিমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারি। বই খুলে দেখি গাছটির নাম স্প্যাথোডিয়া, ইংরেজরা নাম দিয়েছিল আ ফ্রিকান টিউলিপ, আমি ডাকি দ্রপলাশ বলে। আমি নিশ্চিন্ত জানি না, এ নাম আমারই দেওয়া, অথবা কবিগু এ নাম অ াগেই দিয়ে গেছেন। কিন্তু আজ বিশ বছর ধরে সে আমার বন্ধু। আমার পাড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে সকৌতুকে দেখে কাগজকলম নিয়ে আমার নানা ভ্যর্থ প্রচেষ্টা। আর যতই তাকে দেখি উপনিষদের এই প্রতীতি আমার প্রকৃতিবাদী মনে সঞ্চা রিত হয়, আনন্দ থেকেই দেখি উপনিষদের এই প্রতীতি আমার প্রকৃতিবাদী মনে সঞ্চারিত হয়, আনন্দ থকেই সব প্রাণীর জন্ম, আনন্দই সব প্রাণীকে জিইয়ে রাখে। শঙ্করাচার্য বা শোপেনহাওয়ার নয়, এই দ্রপলাশই আমার যথার্থ বন্ধু।

বন্ধুতার জন্য প্রকৃতি সহস্র হাত বাড়িয়ে আছে এবং হাত বাড়িয়ে আছেন বিগত অন্তত দশ হাজার বছরের অসংখ্য কীর্তিম ান স্ত্রীপুষ একথাও যেমন সত্য যে মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ আগ্রাসন আপজাত্য অনেকটা জায়গা জুড়েছে, তেমনই এটাও লক্ষণীয় যে যুগপৎ তারি সঙ্গে সৃষ্টির এবং উদ্ভাবনের ধারাও অবিরাম বহমান। অতীতের সেই সৃজনধর্মী মহ াজনদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন আমাদের আগ্রহ এবং প্রয়াসের উপরে নির্ভর করে। তাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের সুকৃতির বিথরে, এবং সেই সব সুকৃতির সূত্রে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য রচিত হয়। স্কুল - কলেজ নয়, আত্মীয়স্বজন বা পাড় াপ্রতিবেশী নয়, অন্তত আমার এই দীর্ঘ তিরাশি বছরের জীবনে তাঁরাই দিয়েছেন বারে বারে অক্ষয় সৌহাদ্যের অভিজ্ঞতা। হৃদয়ের গভীরতম ক্ষতে প্রজ্ঞার শুশ্রষা যুগিয়েছেন সফক্লেস, সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ; জিজ্ঞাসার শিখাকে বারেবারে উদ্দীপিতি করেছেন সক্রেটিস, চুয়াঙ্ৎসু, হিম,নীটশে, রাসেল; রূপের রহস্যময় অন্তর্লোকের সন্ধান দিয়েছেন অজন্তার অজ্ঞ াতনামা শিল্পীসমাজ, সমুদ্রোত্থিতা ভিনাসের অপ্রতিম চিত্রকর বত্তিচেল্লী, সূর্যোন্মাদ মহাপ্রতিভা ভ্যান গঘ্, প্রেমিক পটুয়া শ

াগাল; অনিঃশেষ আনন্দের আস্বাদন করিয়েছেন মোট্‌সার্ট, স্ট্রাভিনস্কি, বড়ে গোলাম আলি খান, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়; দেহ - জীর্ণ হলেও মনকে জীর্ণ হতে দেননি কালিদা, লি পো, বাসো, কীট্‌স্‌, মীর্জা গালির, রিল্‌কে। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, সুকৃতির মৃত্যু হয় না। তাঁদের কৃতির সূত্রে তাঁরা আমাদের অনিঃশেষ আত্মীয়; তাঁদের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যের স ম্পর্কে কোনও দিক থেকেই কারও স্বার্থসিদ্ধি বা নৈমিত্তিকতার আশঙ্কা নেই। জীবিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যদি এমনিতর নির্ভার স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক রচিত হয় তবে তার চাইতে কাম্য সম্পর্ক আর কি হতে পারে?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com